#আমি পদ্মজা পর্ব ১৭

_____

নৌকা ছাড়ার পূর্বে আকাশের কালো মেঘের ঘনঘটা চোখে পড়ল। তার কিছুক্ষণ পর হঠাৎই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে এলো। খোলা নৌকা হওয়াতে চোখের পলকে যাত্রী পাঁচজন কাকভেজা হয়ে গেল। ভিজলেন না হেমলতা। মোর্শেদ ছাতা ধরে রেখেছেন। বজ্রপাতের সাথে সাথে হেমলতার আত্মা দুলে উঠছে। মনটা খচখচ করছে। তিনি জলের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। জলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার সঙ্গেই বলের মতো

একদলা পানি লাফিয়ে উঠছে। তারপর ছোট্ট ছাতার মতো আকৃতি নিয়ে চারপাশে প্রসারিত হয়ে হাওরে মিলিয়ে যাচ্ছে। দেখতে সুন্দর! কিন্তু সেই সৌন্দর্য মনে ধরছে না। অজানা আশঙ্কায় তিক্ত অনুভূতি হচ্ছে। মোর্শেদ গলা খাকারি দিয়ে হেমলতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। এরপর বলেন,'কিছু খাইবা?'

হেমলতা নিরুত্তর। মোর্শেদ শুষ্ক হাসি হেসে বলল,

'আর কিছুক্ষণ। আইয়াই পড়ছি।'

হেমলতা কিচ্ছুটি বললেন না। নিরুত্তরেই বসে রইলেন। বৃষ্টির স্পর্শ

নিয়ে আসা হাওরের হিমেল বাতাসের ছোঁয়া লাগছে চোখেমুখে। হাওরের ঘোর লাগা বৃষ্টি দেখতে দেখতে তন্দ্রা এসে ভর করে। হেমলতা নিকাব খুলে চোখেমুখে পানি দিয়ে তন্দ্রা কাটান। এরপর ক্লান্ত চোখ দু'টি মেলে তাকান মোর্শেদের দিকে। মোর্শেদের হাতে হাত রেখে বলেন,'আমার এতো খারাপ লাগছে কেন? বুক পোড়া কষ্ট হচ্ছে।'

মোর্শেদ হেমলতার কণ্ঠ শুনে সহসা উত্তর দিতে পারলেন না। চিত্ত ব্যাথায় ভরে উঠল। কিছুসময় অতিবাহিত হওয়ার পর আশ্বস্ত করে

বললেন,’আইয়া পড়ছি তো। ওইযে বাজারের ঘাট দেহা যাইতাছে।’

হেমলতা মোর্শেদের হাত ছেড়ে দূরে তাকান। অলন্দপুরের বাজারটা ছোট পিঁপড়ার মতো দেখাচ্ছে। নৌকাটা বার বার দুলছে। চারিদিকে ঝড় বইছে। মনেও তো বইছে। তিনি নিজেকে শান্ত করতে চোখ বুজে বার কয়েক প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেন। ব্যাথাতুর মন আর্তনাদ করে শুধু জানতে চাইল,আমার মেয়েগুলো কেমন আছে?

_____

রীনা চুল এতো শক্ত করে ধরেছে যে পদ্মজার সারা শরীর ব্যথায় বিষিয়ে

উঠছে। পদ্মজা আকুতি করেও ছাড়া পাচ্ছে না। পূর্ণা,প্রেমা খামচে ধরে রেখেছে পদ্মজাকে। কিছুতেই তারা বোনকে ছাড়বে না।

আমির ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হয়ে চিৎকার করে উঠল, ‘কামরুল চাচা এটা ঠিক হচ্ছে না! মেয়েগুলোর অভিশাপে পুড়ে যাবেন।’

আমিরের উৎকট উত্তেজনায় ক্ষণকালের জন্য কামরুল হতবুদ্ধি হয়ে গেল। রমিজ আলী কামরুলের নরম, নিঃশ্বব্দ, ভয়ার্ত মুখের দিকে চেয়ে ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল,’বেশ্যাদের শাপে কেউ পুড়ে না।’

জলিল প্রেমাকে সরিয়ে নিয়েছে। প্রেমার কান্না শোনা যাচ্ছে। বড় আপা,বড় আপা করে গলা ফাটিয়ে কাঁদছে। ছইদ অনেক টেনেও পূর্ণাকে সরাতে পারল না, তাই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পূর্ণার বুকে নোংরা হাতের দাগ বসিয়ে দিল। পূর্ণা এমন ঘটনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। কোনো মেয়েই এমন নীচু ঘটনার সাক্ষী হতে চায় না। অকস্মাৎ এই ঘটনা কাটিয়ে উঠার পূর্বেই একটা শক্ত হাত পায়জামার ফিতা টেনে ধরল। পূর্ণার

পায়ের তলার মাটি সরে গেল। ভয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল,'আপা...আপা।'

পূর্ণার আর্তনাদ পদ্মজার মস্তিষ্ক প্রখর করে তুলল। পদ্মজা মুখ তুলে পূর্ণার দিকে তাকাল। তার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি দূরে পূর্ণা। পদ্মজার এক হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে সে। কাছে আসতে পারছে না ছইদের জন্য। পূর্ণার কান্না দেখে পদ্মজা আতঙ্কে নীল হয়ে গেল। চারিদিকে কোলাহল। গালি দিচ্ছে মা বাপ তুলে। কেউ বলছে না, মেয়েটা ভালো। এরকম করতেই পারে না। পূর্ণা চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কেঁদে মাকে ডাকছে।

পদ্মজা এক দৃষ্টে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষ এরকম কেন হয়?
পূর্ণার হাত ছইদ আলগা করতেই সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল পদ্মজাকে। তার পুরো শরীর কাঁপছে। হৃৎপিণ্ড এতো জোরে চলছে যে অনুভব করা যাচ্ছে। পূর্ণা কাঁদতে কাঁদতে বলল,'আপা...আপা...কেন মেয়ে হলাম আপা? এত কষ্ট হচ্ছে আপা। আপা..."

পদ্মজার দু'চোখ বেয়ে টুপ করে দু'ফোটা জল পড়ে। এক হাতে শক্ত করে পূর্ণাকে বুকের সাথে চেপে ধরল।

রমিজের উস্কানিতে কামরুল গলা উঁচিয়ে বলল,’নটিরে বাঁন ছইদ।’

পূর্ণার কানে কথাটা আসতেই সে আরো জোরে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরল। পদ্মজা ঠান্ডা স্বরে বলল,’পূর্ণা ছেড়ে দে আমায়।’

রীনা পদ্মজাকে চুলে ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেও পদ্মজা জায়গা থেকে এক চুলও নড়ল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। পূর্ণাকে ফিসফিসিয়ে বলল,’বেঁচে থাকলে সব উসুল হবে। ছেড়ে দে।’

পদ্মজার কণ্ঠে কী যেন ছিল। পূর্ণা সাথে সাথে শান্ত হয়ে গেল। চোখ তুলে পদ্মজার দিকে তাকাল। পদ্মজার গাল

বেয়ে রক্ত ঝরছে।ছইদ পূর্ণাকে নিতে আসলে পদ্মজা একটি দুঃসাহসিক কাজ করে বসল। ছইদের অণ্ডকোষ বরাবর লাথি বসিয়ে দিল। ছইদ মাগো বলে কুঁকিয়ে উঠল। জলিলসহ উপস্থিত তিন জন তেড়ে আসল পদ্মজার দিকে। পূর্ণাকে ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে কেউ পদ্মজাকে থাপ্পড় দিল, কেউ বা দিল লাথি। দু'তিনজন গ্রামবাসীর মনে মায়া উদয় হলো। ছুটে আসল পদ্মজাকে বাঁচাতে। প্রান্ত ভয়ে চুপসে গিয়েছিল। পদ্মজাকে কাঁদায় ফেলে মারতে দেখে দৌড়ে আসে, জলিলের হাতে শরীরের সব শক্তি দিয়ে

কামড় দিল। জলিল প্রান্তের কান বরাবর থাপ্পড় বসাতেই প্রান্তের মাথা ভনভন করে উঠল। পরিস্থিতি বিগড়ে যেতে দেখে কামরুল হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। মনে মনে বেশ ভয় পান। কেশে গলা পরিষ্কার করে, দুই হাত তুলে চেঁচিয়ে বললেন,'তোমরা থামো,এইডা কি করতাছো? থামো, কইতাছি। সবাই সইরা আসো। থামো...!"

সবকিছু থেমে গেল। পদ্মজা কাচুমাচু হয়ে পড়ে রইল কাঁদায়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। নাভির নিচে একটা লাথি পড়েছে বেশ জোরে। চোখ বুজে

রেখেছে। দু’হাত বুকের উপর। লম্বা চুল কাঁদায় মেখে ছড়িয়ে আছে আশেপাশে। যন্ত্রনায় যেন পাঁজরগুলো মড়মড় করে ভেঙ্গে যাচ্ছে। পূর্ণা জ্বরের তোপে জ্ঞান হারিয়েছে। হেমলতার মা মনজুরা বাড়িতে ঢুকে পদ্মজাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে আঁতকে উঠলেন। দৌড়ে এসে পদ্মজাকে তুলতে চাইলে কামরুল হুংকার ছাড়েন,’এই ছেড়িরে ধরন যাইব না। যান এন থাইকা।’

মনজুরা পদ্মজার কামিজ ঠিক করে দিলেন। এরপর দুজন লোককে নিয়ে পূর্ণাকে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন।

মনজুরার বুক কাঁপছে হেমলতার ভয়ে। হেমলতা বার বার বলেছিল, দুই দিন তার মেয়েদের চোখের আড়াল না করতে! আর তিনি একা বাড়িতেই ছেড়ে দিয়েছেন! ইচ্ছে হচ্ছে এক ছুটে কোথাও পালিয়ে যেতে। হিমেল নাক টেনে টেনে কাঁদছে। জপ করছে হেমলতার নাম। মনজুরা রেগে ধমক দেন,'আহ! থাম তো।'

বাপের বাড়িতে কাউকে না পেয়ে হেমলতা চিন্তায় পড়েন। মোর্শেদ বললেন,'আমরার বাড়িত গিয়া বইয়া রইছে মনে হয়। আও বাড়িত যাই।'

হেমলতা মিনমিনে গলায় বলেন, ‘তাই হবে।’

দুজন হেঁটে বাড়ির রাস্তায় উঠে। তখন পাশ কেটে একজন মহিলা হেঁটে যায়। কিছুটা হাঁটার পর মোর্শেদের খটকা লাগল। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান। মহিলাটি অনেক দূর অবধি চলে গিয়েছে। মহিলার অবয়ব দেখে মোর্শেদের বাসন্তীর কথা মনে হলো। মনে মনে আওড়ান,’বাসন্তী আইছে?’ পরপরই নিজের মনকে বুঝ দেন,’না,না হে আইব কেমনে। আর আইলেও যাইব গা ক্যান?’

তিনি আর মাথা ঘামালেন না।
হেমলতার বুক দুরুদুরু করছে। ঠান্ডা বাতাস বইছে। তবুও তিনি ঘামছেন অজানা আশঙ্কায়। বাড়ির কাছাকাছি এসে তিনি দেখতে পেলেন,মাতব্বরকে। মাতব্বরের সাথে আরো দুজন ব্যক্তি। এছাড়া বাড়ির সামনে মানুষের ভীরও দেখা যাচ্ছে। হেমলতার হৃৎপিণ্ড যেন থমকে গেল। মেরুদণ্ড বেয়ে বরফের ন্যায় ঠান্ডা কিছু একটা ছুটে গেল। তিনি নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে ছুটতে থাকেন। পিছলা খেয়ে পড়ে যেতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেন। হেমলতার দৌড় দেখে মোর্শেদ

অবাক হোন। প্রশ্ন করেন,’তুমি দৌড়তাছো ক্যান?’

হেমলতা প্রশ্নটি শুনলেন না। নিকাব বাতাসের দমকে উড়ে পড়ল দূরে। তিনি ভীর ঠেলে বাড়িতে ঢুকেন। কোলাহল বেড়ে গেল। এতো ভীরের মাঝে একটা মেয়েকে পড়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক হোন। অন্ধকারে মেয়েটিকে চিনতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। তিনি আঙ্গুল তুলে বিড়বিড় করেন,’মেয়েটা কে?’

হেমলতার প্রশ্ন কারো কান অবধি গেল না। কোথা থেকে একটি আলো এসে পড়ে পদ্মজার উপর। সাথে সাথে

হেমলতার চক্ষুদ্বয়ের সামনে পদ্মজার কাঁদারক্তে মাখা মুখ ভেসে উঠল। হেমলতা গগণ কাঁপিয়ে আর্ত চিৎকার করে উঠলেন,'পদ্মজারে...."

পদ্মজার বুক ধড়াস করে উঠল! অস্তিত্ব কেঁপে উঠল। আম্মা এসেছে! তার পৃথিবী! তার শক্তি! পদ্মজা দূর্বল দুই হাতে ভর রেখে উঠে বসার চেষ্টা করল। পারল না। ভাঙ্গা গলার জোর দিয়ে শুধু ডাকল,'আম্মা...আম্মা।" হেমলতার পৃথিবী থমকে গিয়েছে। বিধ্বস্ত, পর্দাহীন,কাঁদা,রক্তমাখা পদ্মজাকে দেখে বিশ্বাস হচ্ছে না, এটা তার মেয়ে। তিনি দ্রুত নিজের বোরখা

খুলে পদ্মজাকে ঢেকে, বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। অসহনীয় যন্ত্রনায় যেন কলিজা বেরিয়ে আসছে তার। তার সোনার কন্যার এ কী রূপ! কে করলো? কাঁপা কণ্ঠে বললেন,'পদ্ম...আমার পদ্ম।"

হেমলতার বুকে মাথা রেখে পদ্মজা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

বলল,'আম্মা...আম্মা।'

হেমলতা পদ্মজাকে আরো জোরে চেপে ধরেন বুকের সাথে। দৃষ্টি অস্থির। বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে।

মোর্শেদ বাড়িতে ঢুকে উঁচু গলায় বলেন,'এইহানে এতো মানুষ ক্যান?

মাতব্বর মিয়া আপনে এইনে ক্যান? কী অইছে?’

প্রান্ত,প্রেমা দৌড়ে এসে মোর্শেদকে জড়িয়ে ধরল। দুজন ভয়ে কাঁদছে,কিন্তু কান্নার শব্দ হচ্ছে না। মোর্শেদ বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মাতব্বর মজিদ গম্ভীর কণ্ঠে কামরুলকে প্রশ্ন করেন,’ মেয়েটার এই অবস্থা কারা করেছে? এটা কী নিয়মের মধ্যে পড়ে?’

কামরুল মাথা নিচু করে রেখেছেন। মিনমিনে গলায় বলেন,’আমি ছেড়িডারে মারতে কই নাই। জলিল,ছইদ, আর মজনুর ছেড়ায় নিজ ইচ্ছায় মারছে।’

‘আপনি আটকালেন না?’

‘আটকাইছি বইললাই মাইয়াডা বাঁইচা আছে। আর এমন নটিদের বাঁচার অধিকার নাই।’

‘থামেন মিয়া! কার কী শাস্তি হবে সেটা আমার দায়িত্ব। আপনার না।
ছইদ,জলিল আর মজনুর ছেলেকে তো দেখা যাচ্ছে না। আগামীকাল তাদের আমি মাঠে দেখতে চাই।’

কামরুল মাথা নিচু করে রাখলেন। মজিদ হাওলাদার ভারি সৎ এবং নিষ্ঠাবান মানুষ। গ্রামের মানুষদের দুই হাতে আগলে রেখেছেন। পুরো অলন্দপুরের মানুষ মজিদকে

ফেরেশতা সমতূল্য ভাবে। পঁচিশ বছর ধরে অলন্দপুর সামলাচ্ছেন তিনি।

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। হেমলতা কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারছেন না। অনেক বছর আগের ঘটনা আর এই ঘটনা হুবুহু একরকম কী করে হলো? তিনি নিজের ভেতর একটা হিংস্র পশুর উপস্থিতি অনুভব করছেন। কামরুলের মুখ থেকে শোনা তিনটা নাম মস্তিষ্কে নাড়া দিচ্ছে প্রচন্ডভাবে! ছইদ,জলিল আর মজনুর ছেলে!

মজিদ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন,'আগামীকাল সবাই স্কুল মাঠে

চলে আসবেন। মিয়া মোর্শেদ মেয়ে নিয়ে আলো ফুটতেই চলে আসবেন। এই বাড়ি পাহারায় থাকবে মদন আর আলী। আমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। ঠিক সময়ে সেও উপস্থিত থাকবে।’

চলবে....